প্রতিমাসে প্রায় দুই কোটি টাকার মতো ঘুষের লেনদেন হয় ঢাকার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে। মধ্যস্বত্বভোগী অসৎ কর্মচারী ও দালালরা মিলে সেখানে অনিয়মকেই দিয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। কীভাবে চলে এই ঘুষের আদান-প্রদান...

## আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ঢাকা

# ঘুষ দেয়াই নিয়ম!

রিপোর্ট : **বদরুদ্দোজা বাবু**

ঢাকার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে প্রতিদিন কত টাকা ঘুষের লেনদেন হয়? আমাদের দেশের সরকারি অফিসগুলোতে দুর্নীতি আছে, আছে ঘুষের প্রচলন। এ কথা সবারই জানা। আর এসবই ঘটে লোকচক্ষুর আড়ালে। কিন্তু অন্যান্য সরকারি অফিসের হিসাবের সঙ্গে পাসপোর্ট অফিসের হিসাব মেলে না। ঘুষ চাওয়া হয় সরাসরি, নেয়াও হয় চোখের সামনে। এটাই এখানকার নিয়ম। প্রতিদিন এভাবে কত টাকা লেনদেন হয় তার হিসাব দেয়াটা কঠিন। আনুমানিক একটি হিসাব হয়তো দেয়া যেতে পারে। মাসে এই হিসাব গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় দুই কোটির কাছে। কীভাবে ঘটে এই ঘুষের লেনদেন এবং এই টাকার কে কত ভাগ পায়? এর উত্তরও পাওয়া গেছে ঢাকার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে।

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর। এলজিইডি ভবনের সামনের ভবনটি পাসপোর্ট ভবন নামে পরিচিত। ভবনের দু'পাশে বস্তি। ঢাকার নামকরা বিএনপি বস্তি ঘিরে রেখেছে এই ভবনকে। বেবিট্যাক্সি থেকে পাসপোর্ট অফিসের গেটে নামার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ঘিরে ধরলো। 'পাসপোর্ট করাইবেন তো, আমরা কইরা দিমু। সহজে পাইয়া যাইবেন'— এভাবেই তিন-চারজন দালাল তাদের মাধ্যমে পাসপোর্ট করার আহ্বান জানালেন। অবশ্য পরবর্তীতে এ কথার প্রমাণও পাওয়া গেছে। সিঁড়ির পাশে অনুসন্ধান লেখা। ভেতরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন দালাল এগিয়ে এলো। নাম তার মাসুম। পাসপোর্ট করার বিষয়ে জানতে চাই এ কথা শুনে সে হেসে বললো, 'এইখানে কোনো লোক পাইবেন না। আর হেগো তন আমরাই ভালা জানি। নিচতলায় একটা বোর্ড আছে সেখানে সব লেখা আছে।'

একটি বড় বিলবোর্ডে পাসপোর্ট করার নিয়মাবলী লেখা। কয়েক বছরের ধুলা পড়ে বোর্ডটির লেখাগুলো এখন অস্পষ্ট। তারপরও বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে নিয়মগুলো বোঝার চেষ্টা করছি। সাহায্যের জন্য এখানেও এগিয়ে এলো দু'জন দালাল। বললো, 'বোর্ড দেইখ্যা লাভ নাই। যদি আর্জেন্ট কাম হয়, তাহলে আমগোরে কাম দেন। তা না হইলে পরে কপাল থাবড়াইবেন। সময়মতো পাসপোর্ট পাইবেন না।' ছেলে দুটি পাসপোর্ট অফিসের লিখিত নিয়মের পাশাপাশি তাদের অলিখিত নিয়মের সুবিধার কথা বললো। ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, লিখিত নিয়েমের চেয়ে অলিখিত নিয়মের চর্চাই হয় এখানে বেশি।

**অনিয়মই নিয়ম**

অনিয়মই এখন পাসপোর্ট অফিসের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু কর্মচারী, দালালরা এ চর্চা করে না, পাসপোর্ট করতে আসা সাধারণ জনগণও এর সঙ্গে জড়িত। সাধারণ মানুষেরও এক্ষেত্রে উপায় নেই। কারণ তারা চায় সময়মতো যাতে তাদের

করতে দেয়া পাসপোর্ট উঠাতে পারে। বোর্ডের লিখিত নিয়ম তাদের এ নিশ্চয়তা না দিতে পারলেও দালালদের অলিখিত নিয়ম তা পারে। পাসপোর্ট অফিসের দালালরা এ কথাটি জোর দিয়ে বলছে। ধরুন অতি জরুরিভিত্তিতে আপনার পাসপোর্টের প্রয়োজন। দুই/তিন দিনের মধ্যে অবশ্যই পাসপোর্ট নিতে হবে। বোর্ডে লিখিত নিয়ম আছে, অতি জরুরি পাসপোর্ট হলে দেয়া হবে ৮ দিনে। এজন্য ঐ ব্যক্তিকে দিতে হবে তিন হাজার একশ' পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু আপনি ৮ দিনেও পাসপোর্ট পাবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। পুলিশ ভেরিফিকেশনের কথা বলে তা ১৫ দিনেও গড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। এতো গেল নিয়মের কথা। মাত্র ৮৫০ টাকা বেশি খরচ করলে কাজ হবে বিদ্যুতের মতো। ৮ দিনের পাসপোর্ট আপনি পেয়ে যাবেন ২৪ ঘন্টায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই সময়ের মধ্যে আপনি পাসপোর্ট আপনার হাতে পেয়ে যাবেন। মাঝে মাঝে কয়েক ঘন্টা সময় বেশি লাগতে পারে। সময়মতো কিংবা সময়ের আগে পাসপোর্ট দেবার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আর তারা এ কাজটি করায় কর্মচারীদের দিয়ে যারা নিয়মমত এলে পাসপোর্ট দিতে ব্যর্থ হয়। সময়মতো পাসপোর্ট দেয়া হলে তো আপনি কখনোই দালালদের কাছে যাবেন না। তাহলে কর্মচারী, দালালদের ঘুষের যে আয় তা বন্ধ হয়ে যাবে। আর এই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছে কর্মচারীরা।

কর্মরত পুলিশ ও এখন দালাল। কুদ্দুস পুলিশ ও শওকত পুলিশ পাসপোর্টের দালাল হিসেবে পরিচিত। টেবিল বসিয়ে দালালরা ফরম পূরণ করছে

পাসপোর্ট অফিসের সরকারি প্রত্যেকটি রেটের পাশাপাশি দালালদের, কর্মচারীদের নিজস্ব রেট রয়েছে। দালালদের রেট একটু বেশি হলেও এখন সবচেয়ে প্রচলিত। কারণ সাধারণ মানুষ এত ঝক্কি-ঝামেলা নিতে চায় না। সাধারণ একটি পাসপোর্ট করতে যদি এত কাঠখড় পোড়াতে হয় তাহলে কীভাবে চলে! কয়েকশ' টাকা বেশি দিয়ে হলেও তারা দালালের শরণাপন্ন হয়। এতে অন্তত অল্প সময়ে পাসপোর্ট পাবার নিশ্চয়তা থাকে। নিয়ম অনুযায়ী, এক মাস ১০ দিনে পাসপোর্ট বের করতে হলে ১২শ' ৫০ টাকা খরচ হয়। অর্ধেকেরও কম সময়ে মাত্র ১৫ দিনে দালাল, কর্মচারীরা দুই হাজার টাকার বিনিময়ে এ পাসপোর্ট বের করে দেয়। ৭৫০ টাকায় পাসপোর্ট বের করতে নিয়ম অনুসারে সময় লাগে দুই থেকে তিন মাস। ১৫শ' টাকা খরচ করলেই এ পাসপোর্ট পাওয়া যায় এক মাসে। তাহলে কেন একজন মানুষ সরকারি নিয়মে পাসপোর্ট করবেন? পাসপোর্ট নিয়ে হয়রানির অভিযোগও অনেক আছে। পাসপোর্ট অফিসের দোতলায় দেখা হলো একজন ভদ্র মহিলার সঙ্গে। গত তিন-চার দিন আগে তার পাসপোর্ট দেয়ার সময় চলে গেলেও তিনি এখনও পাসপোর্ট হাতে পাননি। প্রতিদিন একবার করে পাসপোর্ট অফিসে আসছেন। কাউন্টারে বসা কর্মচারীকে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, তার হাতে এখনও পাসপোর্ট আসেনি। কিন্তু ভদ্র মহিলার চিকিৎসা করতে ভারতে যাবার জন্য পাসপোর্টটি খুবই প্রয়োজন। সাংবাদিক শুনে তিনি নাম জানাতে চাননি। তিনি ভয় পাচ্ছেন, পত্রিকায় তার নাম উঠলে শেষ পর্যন্ত যদি পাসপোর্ট না পান।

কর্মচারীরা নিজেদের স্বার্থে জটিলতা তৈরি করে রেখেছে। ধরুন সামান্য ভুলের জন্য হয়তো আপনার পাসপোর্ট ফরমটি আবার নতুন করে পূরণ করতে হতে পারে। ফরমে প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তার সত্যায়িত ছবি লাগাতে হয়। আপনি যদি দালালদের কাছ থেকে সত্যায়িত না করান তাহলে কাউন্টারে বসা কর্মচারী প্রশ্ন করতে পারে, যাকে দিয়ে সত্যায়িত করিয়েছেন সেকি আদৌ আছে?

**দালাল তিনশ'র ওপরে**

পাসপোর্ট অফিসের একজন কর্মচারীর পক্ষে সম্ভব হয় না, জনে জনে ধরে পাসপোর্ট করার কাজ চাওয়া। তাদের এ অসুবিধা দূর করেছে দালালরা। ইস্কাটনে যখন এই পাসপোর্ট অফিস ছিল তখনও দালাল ছিল, এখনও আছে। তবে সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। এখন এই দালালের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিনশ'র ওপরে।

মাস্টার্স পাস থেকে শুরু করে বস্তির সন্ত্রাসী পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের, বিভিন্ন ধরনের দালাল রয়েছে। পাশে বিশাল বস্তি থাকার কারণে বস্তিবাসী দালালের সংখ্যাই বেশি। অফিস খোলার আগেই ফরম হাতে এসব দালাল পৌঁছে যায় গেটে। গেটের পাশে কাউকে নামতে দেখলেই জেঁকে ধরে তারা। পিছু নেয় তাদের। ততক্ষণ পর্যন্ত আহ্বান জানাতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত পাসপোর্ট করার কাজটি তাদের হাতে তুলে না দেয়। হাবিব, মোস্তাক, মাসুম, হেলাল, শামীম– এরা সবাই এখানকার দালাল। প্রতিদিনই তারা কাজ পায় না। কোনো দিন হয়তো দেখা যায় দুই তিনটি পাসপোর্টের কাজ আসে, কোনো দিন আসে না। তবে গড়ে প্রতিদিন দুই-তিনশ' টাকা থাকে। দালালদের ক্ষেত্রে শুধু কাজ ধরা নয়, কাজটি করানোর জন্য চাই কর্মচারীর সঙ্গে সখ্য। একেকজন দালাল একেকজন কর্মচারীকে দিয়ে কাজ করান। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, কর্মচারীর সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে দালালের পক্ষে কোনোভাবেই কাজ করানো সম্ভব নয়। আর কর্মচারীদেরও

দালালের প্রয়োজন। অর্থাৎ একে অপরের পরিপূরক, সহায়ক।

তিন ধরনের দালাল আছে। ছোট, মাঝারি ও বড়। ছোট দালাল গ্রুপের সদস্যদের বয়স পাঁচ বছর থেকে ১২ বছর। এরা এক হাতে গাম অন্য হাতে স্টেপলার মেশিন নিয়ে পাসপোর্ট অফিসে ঘোরে। ফরম জমা দিতে আসা কারো দরকার হলে পাঁচ টাকার বিনিময়ে এই সুবিধা পায়। দিনে গড়ে একেকজনের ৩০/৪০ টাকার মতো থাকে। মাঝারি গ্রুপের দালালদের কাজ হচ্ছে পাসপোর্ট ফরম এবং স্ট্যাম্প বিক্রি করা। এজন্য তারা ২০ টাকা নিয়ে থাকে। এতে আপনার সুবিধা হচ্ছে, কষ্ট করে ব্যাংকে গিয়ে ফরম ও কোর্টে গিয়ে স্ট্যাম্প সংগ্রহ করতে হবে না। এখানেই পেয়ে যাবেন। এই সুবিধার জন্য দালালরা ১৫ টাকা বেশি নেয়। দালালরা নিজেদের সুবিধার জন্য সরাসরি ফরম না কিনে ফটোকপি করিয়ে নেয়। এতে খরচ আরো কমে গেল। আপনি যদি ফরম ফটোকপি করে নিয়ে যান তাহলে দেখা যাবে সেটি কর্মচারীরা ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দালালরা যদি নিজ হাতে ফটোকপি ফরম দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে অসুবিধা হয় না। মাঝারি গ্রুপের দালালদের মধ্যে কিছু মহিলাও রয়েছে। এরা ছেলেদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ফরম বিক্রি করে। এই গ্রুপের গড় আয় হচ্ছে ৮০ থেকে ১০০ টাকা। বড় দালালদের কাজ হচ্ছে পাসপোর্ট করিয়ে দেয়া। তারা অফিসের সামনের দোকানগুলোতে দাঁড়িয়ে থাকে। যারা ফরম বিক্রি করে তারাই তাদের জন্য কাজ নিয়ে আসে। মূলত বড় দালালদের সঙ্গেই কর্মচারীরা যোগাযোগ রক্ষা করে। গড়ে এদের প্রতিদিন আয় হয় তিন-চারশ' টাকা।

দালালদের অধিকার আদায়ের জন্য রয়েছে একটি সমিতি। সব দালাল এই সমিতির কথা মতো চলে। প্রতিদিন প্রত্যেক দালালকে সমিতির প্রতিনিধির কাছে ২০ টাকা দিতে হয়। পুলিশ যাতে 'ঝামেলা' না করে সেজন্য এই টাকা দেয়া হয়। তিনশ' জন দালালের প্রত্যেকেরই এই চাঁদা দেয়া বাধ্যতামূলক। মোহাম্মদপুর থানায় প্রতি মাসে চলে যায় এই টাকা। এছাড়াও টহল পুলিশ, পেট্রোল পুলিশও ভাগ পায়। টাকার কমতি হলে পুলিশের তৎপরতা শুরু হয় বলে জানান দালালরা।

**রয়েছে ঘুষ সমিতি**

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারীদের রয়েছে ঘুষ সমিতি। রেজিস্ট্রেশন করা কোনো সমিতি নয় এটি। সব কর্মচারীর মাঝে ঘুষের

পাসপোর্ট অফিসের কর্মচারীদের রয়েছে ঘুষ সমিতি। রেজিস্ট্রেশন করা কোনো সমিতি নয় এটি। সব কর্মচারীর মাঝে ঘুষের বন্টন করার জন্য গঠিত হয়েছে এই ঘুষ সমিতি

বন্টন করার জন্য গঠিত হয়েছে এই ঘুষ সমিতি। প্রতিদিন ঢাকার এই আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে প্রায় ১৪শ'র মতো পাসপোর্ট করানো হয়। বেশির ভাগ পাসপোর্টই হয় ঘুষের বিনিময়ে। দালাল ছাড়াও ট্রাভেল এজেন্সি, রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে কর্মচারীদের কাছে পাসপোর্ট করার কাজ আসে। এখন দেখা যাক, কর্মচারীদের মাঝে কীভাবে এই ঘুষের ভাগ-বাটোয়ারা হয়।

ধরা যাক, দালাল ফারুকের কথা। সে ১২৫০ টাকার পাসপোর্ট ২০০০ টাকার বিনিময়ে ১৫ দিনে করার কাজ নেয়। এক্ষেত্রে সে বেশি নেয় ৭৫০ টাকা। এই টাকার মধ্যে দালালের ৫০ টাকা খরচ হয় ফরম, স্ট্যাম্প সংগ্রহ ও যাতায়াত বাবদ। সব কিছু তৈরি করে ফারুক নিয়ে যায় তার পরিচিত কর্মচারীর কাছে। নিজে ২০০ টাকা রেখে বাকি ৫০০ টাকা তুলে দেয় ঐ কর্মচারীর হাতে। কর্মচারী নিজের কাছে ২০০ টাকা রেখে বাকি ২০০ টাকা দিয়ে দেয় ঘুষ সমিতিতে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ হয়ে গেলে পাসপোর্ট দিয়ে দেয়া হয় দালালের হাতে। সব কর্মচারীর জন্য এই ব্যবস্থা। কারণ একজন কর্মচারীর পক্ষে পাসপোর্ট বের করা সম্ভব নয়। অনেক টেবিল ঘুরে একটি পাসপোর্ট তৈরি হয়। কর্মচারীরা যেখান থেকেই কাজ আনুক না কেন, তাকে সমিতির ফান্ডে নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতেই হবে। মাস শেষে জমা হওয়া এই ঘুষের টাকা বেতনের স্কেল অনুসারে বন্টন হয় কর্মচারীদের মধ্যে। ভাগ চলে যায় ওপরের কর্মকর্তা পর্যন্ত।

সূত্র থেকে জানা যায়, মোট টাকার শতকরা ৪০ ভাগ পায় উপপরিচালক। ২০ ভাগ পায় সহকারী পরিচালকবৃন্দ। বাকি ৪০ ভাগ কর্মচারীদের মধ্যে পদমর্যাদা অনুযায়ী ভাগ হয়। একটি ভাগ চলে যায় এসবির কাছে। কারণ তারাও পাসপোর্টের ভেরিফিকেশন কাজের সঙ্গে জড়িত। সূত্র জানায়, ঘুষ সমিতির এই বন্টনের তদারকি করে পিয়ন আইয়ুব। পাগলা আইয়ুব নামে সে পরিচিত। পাসপোর্ট অফিসে সে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। নিজেকে ডিজির লোক হিসেবে পরিচয় দেয়। উপ-পরিচালকের কক্ষে পাসপোর্টে সিল লাগানো তার কাজ। দালালদের সঙ্গেও রয়েছে তার বেশ ওঠাবসা। অনেক দালালের মুখেই তার নাম শোনা গেছে। তারা সবাই আইয়ুবের মাধ্যমে পাসপোর্টের কাজ করায়। গত ৭/৮ বছর ধরে আইয়ুব হেড অফিস ও আঞ্চলিক অফিসে কর্মরত। দুই মাস আগে এই অফিসে বদলি হয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে সে এই অফিসে তার বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলেছে। প্রতিদিন তার আয় আছে গড়ে দুই হাজার টাকা। এছাড়া ঘুষ সমিতির ভাগ তো আছেই। আইয়ুবের মতো আরো অনেক কর্মচারীর নাম শোনা যায়, যাদের মাধ্যমে দালালরা কাজ করিয়ে থাকে। আবুল হোসেন সরকার, আউয়াল, বেল্লাল, রাজ্জাক এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কর্মচারীদের নাম জানতে চাইলে দালাল ফারুক বলেন, 'সব কর্মচারীই ঘুষ খায়। কার নাম কমু। একজনেরে দিয়া

মোট টাকার শতকরা ৪০ ভাগ পায় উপপরিচালক। ২০ ভাগ পায় সহকারী পরিচালকবৃন্দ। বাকি ৪০ ভাগ কর্মচারীদের মধ্যে পদমর্যাদা অনুযায়ী ভাগ হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের লক্ষ্যই থাকে চাকরি জীবনে ঢাকার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে একবার বদলি হয়ে আসা

তো কাজ করাই না। যখন যারে পাই তারে দিয়া করাই।' ট্রাভেল এজেন্সি, রিক্রুটিং এজেন্সি থেকেও পাসপোর্ট করানো হয়। এক সাথে কাজ আসে অনেক। কর্মচারীদের এখানে লাভও হয় বেশি। দালালের ভাগ না থাকায় তাদের টাকার হিসাবও বেশি। কর্মচারীরাও এ ধরনের কাজ করতে আগ্রহী।

প্রশ্ন হচ্ছে, একজন কর্মচারীর তাহলে মাসে আয় কত? ৪০ হাজারের ওপরে এ কথা নিশ্চিত। মাঝে মাঝে এ হিসাব আরো বিশাল অংকে গিয়ে দাঁড়ায়। তাই ইচ্ছুক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের লক্ষ্যই থাকে চাকরি জীবনে ঢাকার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে একবার বদলি হয়ে আসা। এজন্য অবশ্য তাদের বিনিয়োগও করতে হয়। তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করতে হয় ঢাকার আঞ্চলিক অফিসে বদলি হতে। তিন বছর থাকতে পারেন এখানে। বছর ঘুরলেই এ টাকা উঠে আসে। তারপর জমি, বাড়ি, সম্পদ সবই করা সম্ভব। ঘুষখোর এসব কর্মচারী-কর্মকর্তার মাঝেও সৎ কর্মচারীদের নাম শোনা যায়। একজন দালাল এ প্রসঙ্গে বলেন, 'তারা অবশ্য বেশিদিন টিকতে পারেন না। কোনো না কোনোভাবে তাদের বদলি করে দেয়া হয়।' দুর্নীতি দমন ব্যুরো, সিআইডি'র ইন্সপেক্টররা মাঝে মাঝে পাসপোর্ট অফিসের দুর্নীতির খবর নিতে আসেন। শেষ পর্যন্ত তারাও 'ম্যানেজ' হয়ে যান।

**পুলিশও দালাল**

পাসপোর্ট অফিসের নিরাপত্তার জন্য রাজারবাগ থেকে পুলিশ আসে। তিন দিন পর পর এসব পুলিশকে পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তন করার কারণ হচ্ছে পুলিশকে যাতে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। বেশি দিন দায়িত্ব দিলেই তারা কর্মচারীদের থেকে আরো বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নিয়ম হচ্ছে কোনো দালাল পাসপোর্ট অফিসের গেটের ভেতর ঢুকতে পারবে না। গেটে পাহারারত পুলিশ প্রতিদিন ৪০০ টাকার চুক্তির বিনিময়ে তারা দালালদের অবাধে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। এই টাকায় হাবিলদার পায় ২০০ টাকা বাকি টাকা ভাগ হয় কনস্টেবলদের মধ্যে। কিছু পুলিশ ডিউটি বাদ দিয়ে দালালদের কাজ ধরিয়ে দেয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। এই তিন দিনে তাদেরও আয় হয় ভালো।

অনেক পুলিশ আবার এত টাকা আয়ের লোভ সংবরণ করতে না পেরে ফিরে আসে পাসপোর্ট অফিসে। দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তারা। এমনই একজন হচ্ছে কুদ্দুস পুলিশ। ৭/৮ মাস আগে পাসপোর্ট অফিসে এসেছিলেন ডিউটিতে। এরপর থেকে এখানে প্রায় প্রতিদিনই তাকে দেখা যায়। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি ২০০০কে বলেন, 'লোকজন বলে পাসপোর্ট কইরা দিতে তাই কইরা দেই।' কুদ্দুস পুলিশের মতো শওকত, মিজান, খায়রুল পুলিশও এখন পাসপোর্টের দালাল।

পাসপোর্ট অফিসে শিক্ষিত দালালের সংখ্যাও কম নয়। এমনও অনেক দালাল আছে যারা মাস্টার্স পাস। চাকরি না পেয়ে এখন তারা দালাল। শহীদুল্লাহ ভূঁইয়া তাদেরই একজন। কেন এ পেশায় এসেছেন প্রশ্ন করলে বলেন, 'কিছু কইরা তো বাঁচতে হইবো। দিনে ২০০-৩০০ আয় হয়। ঝামেলাও আছে। তারপরও খারাপ না।'

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**